**ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন ও ভবিষ্যৎ**

পাঠ্যবই উঠে এসেছে ট্যাব বা স্মার্টফোনের পর্দায়। ছবি: প্রথম আলো

বর্তমানে এমন একটা সময়ে আমরা আছি, যখন শিক্ষাব্যবস্থায় অভূতপূর্ব কিছু ধারণা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, নতুন নতুন কৌশল তৈরি হচ্ছে। এসবই হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের ফলে। প্রশিক্ষণযোগ্য যুব জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা এবং অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি মাথায় রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তুর ডিজিটালাইজেশন করা আবশ্যক। ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রান্তিক অঞ্চল পর্যন্ত ডিজিটাল শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া এখন সহজসাধ্য। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষায় নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা প্রদান করাও এখন সম্ভব। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন আসছে, তা এখন আর অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এটি সম্ভব হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে। ইন্টারনেট এখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য বিশ্বকে অবারিত করে দিয়েছে। যে যেখানে আছে, সেখানে থেকেই পৃথিবীর যেকোনো উৎস থেকে শিক্ষামূলক তথ্য আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

গত এক দশকে শিক্ষাব্যবস্থায় প্রযুক্তির সমন্বয় ও ব্যবহার ছিল যুগান্তকারী একটা পদক্ষেপ। শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ ও আরও ফলপ্রসূ করার জন্য বিশেষায়িত সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ব্যবহার শুরু হয়। মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে কীভাবে শিক্ষাদান করা যায়, সেই ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয় সবচেয়ে বেশি। শিক্ষকেরা মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর এবং ভিডিওর সমন্বয়ে শেখানো শুরু করেন। তখন এটাই ছিল আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি। এই পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে শিক্ষকেরা আরও বেশি কার্যকর শিক্ষাদান করতে সমর্থ হন এবং স্কুল-কলেজগুলোর শিক্ষা পরিচালনার কার্যক্রমও ফলপ্রদ হতে থাকে। কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা ও ট্র্যাকিং সিস্টেমস ব্যবহার করে ছাত্রদের অগ্রগতি পরিচালনা সহজ হয়ে পড়ে। এ ধরনের সিস্টেম ব্যবহারকারী ক্লাসরুমকে ‘স্মার্ট ক্লাসেস’ বলা হয়। প্রযুক্তির আধুনিকায়নের ফলে এই স্মার্ট ক্লাসরুম এখন অনেক দূর এগিয়েছে।

স্মার্ট ক্লাসরুমের প্রধান সমস্যা হলো উচ্চ সেটআপ ব্যয়। তার ওপর হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের রক্ষণাবেক্ষণও অনেক ব্যয়বহুল। তার চেয়ে ক্লাউডে রাখা বিষয়বস্তু যেমন ইউটিউব ইত্যাদি, যা কিনা নিজের ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনের মাধ্যমে দেখা যায়, তা জনসাধারণের জন্য উপযোগী। সারা দেশে ইন্টারনেটের বিস্তারের কারণে এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা এখন গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যেও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। উচ্চমানের শিক্ষা যে শুধু শহর অঞ্চলেই পাওয়া যায়, এ কথাটা এখন আর বলা যায় না।

রেকর্ডকৃত ক্লাসের জনপ্রিয়তা জোরদার হতে শুরু করেছে। সুলভ মূল্যে ইন্টারনেটের উচ্চ ব্যান্ডউইথ প্রাপ্তির কারণে খান একাডেমির মতো শিক্ষামূলক ভিডিও ক্লাসগুলো ছাত্ররা ধীরে ধীরে ব্যবহার করা শুরু করেছে। আমাদের দেশেও ‘টেন মিনিট স্কুল’, ‘রেপ্টো’, ‘শিক্ষক বাতায়ন’, ‘ই-শিক্ষণ’, ‘স্টাডি-প্রেস’ ইত্যাদির মতো আরও বেশ কয়েকটি অনলাইন ক্লাসরুম প্ল্যাটফর্ম কার্যক্রম শুরু করেছে। শিক্ষার্থীরা নিজের সময়-সুযোগমতো নিজের অবস্থানে থেকেই এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

এই এডুকেশন টেকনোলজি বা এডুটেক এখন শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হচ্ছে। প্রাইমারি শিক্ষা, সম্পূরক শিক্ষা, পরীক্ষার প্রস্তুতি, রিস্কিলিং, অনলাইন সার্টিফিকেশন, ভাষা-শিক্ষা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে এডুটেক্ এখন বহুল ব্যবহৃত। পৃথিবী-বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউটগুলো এখন অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি প্রদান করছে। সামনের বছরগুলোয় এডুটেক আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে এখন অনলাইনে শিক্ষাকে আরও ব্যক্তিবিশেষে স্বতন্ত্র করা যাচ্ছে। অর্থাৎ যে শিক্ষার্থীর যেমন প্রয়োজন বা যতটা প্রয়োজন, ঠিক ততটা তাকে শিক্ষাদান করা হবে। এর ফলে একজন শিক্ষার্থী নিজের গতিতে শিখতে পারবে, যা কিনা তার জন্য অধিকতর ফলপ্রদ হবে। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রধান কারণ হচ্ছে, এই স্বতন্ত্র শিক্ষাদানের অভাব। যখন একটা সাধারণ ক্লাসরুমে একজন শিক্ষকের কাছে পঞ্চাশজন ছাত্র থাকে, তখন প্রত্যেক ছাত্রকে আলাদাভাবে দেখার সুযোগ থাকে না। এই ঢালাও শিক্ষার কারণেই বেশির ভাগ শিক্ষার্থী উপযুক্ত শিক্ষাটি গ্রহণ করতে পারে না। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর মেশিন লার্নিং শিক্ষার্থীভেদে যথোপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে।

রেকর্ডকৃত ক্লাসের সঙ্গে সঙ্গে অনলাইন লাইভ ক্লাসেরও প্রসার শুরু হয়েছে। ‘গুগল ক্লাসরুম’ বা অন্যান্য অনেক কোলাবোরেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে শিক্ষক একাধিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইন্টারেকটিভ ক্লাস নিতে পারেন। এই ক্লাসগুলোকে রেকর্ড করে শিক্ষার্থীরা পরে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এডুটেনমেন্ট বা গেমিফিকেশনের মাধ্যমে অনলাইন ক্লাসও এখন দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা খেলার ছলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখতে পারে।

আমাদের মতো দেশে যেখানে কোচিং একটি অতি প্রচলিত সংস্কৃতি, সেখানে অনলাইন শিক্ষাকে সর্বজনীন করে জনপ্রিয় করে তোলাটা একটু কঠিনই বটে। তরুণদের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন করে তোলাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। শিক্ষা তখনই কার্যকর হয়, যখন শিক্ষার্থী সেই শিক্ষাক্রমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এডুটেক বা ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা একজন ছাত্রকে তার নিজের গতিতে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী শিখতে সাহায্য করে। ফলে তা বেশি ফলপ্রসূ হয়।

বাংলাদেশের নাগরিকদের গড় বয়স ২৫ বছর। অর্থাৎ এটি তরুণ জমসমষ্টির দেশ। এর আরেকটি মানে—আমাদের দেশের এই তরুণ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী আগামী দুই দশক ধরে কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারবে। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গবেষণা অনুযায়ী ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী যারা এখন প্রাইমারি শিক্ষাক্রমে প্রবেশ করছে, তাদের যখন কর্মক্ষেত্রে ঢোকার বয়স হবে, সে সময়কার কাজ বা বৃত্তি অথবা পেশা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের হবে, যার সম্বন্ধে এখন আমাদের কোন ধারণাই নেই। তার মানে হলো, এই শিক্ষার্থীদের যদি সেসব কাজের জন্য আমরা তৈরি করতে না পারি, তাহলে জনগোষ্ঠীর এই তারুণ্য বিফলে যাবে। কিন্তু যে কাজ বা পেশা এখন পর্যন্ত শুরুই হয়নি, তার প্রশিক্ষণ আমরা কীভাবে দেব!

আমাদের তরুণ সমাজকে কাজে লাগিয়ে আমরা যদি সত্যিই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাই, তাহলে আমাদের অবিলম্বে মানবসম্পদের ওপর বিনিয়োগ করতে হবে। এডুটেক বা ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োগ করে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের অজানা কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে উদ্ভাবনীমূলক ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু করতে হবে। গতানুগতিক টেক্সট বইভিত্তিক শিক্ষায় একজন শিশুর বা তরুণের নিজস্ব মেধার বিকাশ ঘটে না। মুখস্থবিদ্যার বদলে নতুন কিছু তৈরিকে, অথবা নতুন চিন্তাধারাকে উৎসাহিত করতে হবে। যার যে বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে, তাকে সে বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং প্রয়োগ করে যে শিক্ষার্থীর যে বিষয়ে ঝোঁক বা প্রবণতা রয়েছে, তাকে সে বিষয়ে সুদক্ষ করে তুলতে পারলেই আমরা একটি দক্ষ জাতি তৈরিতে সক্ষম হব।

শিক্ষাব্যবস্থার যে পরিবর্তন প্রয়োজন, তা আমাদের মতো দেশে করাটা হয়তো কিছুটা কঠিন হতে পারে। এখানে সমাজ-সংস্কৃতির একটা পরিবর্তন আনতে হবে। জনসচেতনতা তৈরিতে সরকারসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। গতানুগতিক বিষয়গুলোয় ব্যাচেলর বা মাস্টার ডিগ্রি লাভের পেছনে না ছুটে নতুন নতুন বিষয়ে ও পেশাতে দক্ষতা অর্জন যে অধিকতর শ্রেয় এবং ফলপ্রসূ, তা অভিভাবকদের বোঝাতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে প্রায় ২৬ লাখ শিক্ষিত বেকার রয়েছে এবং দক্ষতার অভাবে যে তারা কাজ পাচ্ছে না, এ জিনিসটা সবাইকে জানাতে হবে। উদ্ভাবনীমূলক ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা থাকলে, ভবিষ্যতের যেকোনো নতুন পেশা বা কাজে নিজেদের সহজে সম্পৃক্ত করা যায়, এ ব্যাপারে সবার সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আরেকটি বড় ত্রুটি হচ্ছে বর্তমানে এখানে তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম চালু রয়েছে জাতীয় পাঠ্যক্রম, মাদ্রাসাভিত্তিক পাঠ্যক্রম, ও ব্রিটিশ/ইউরোপীয় পাঠ্যক্রম। এর একটির সঙ্গে অপরটির কোনো রকম মিল বা সমন্বয় নেই। ফলে এই তিনটি ভিন্ন পাঠ্যক্রমে পড়া ছাত্রছাত্রী সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে বড় হচ্ছে। এতে সমাজে একটা বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে, একই দেশে তিন ধরনের নাগরিক তৈরি হচ্ছে, যা আমাদের মতো একটা সমজাতিক দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। আমাদের উচিত এখনই সব পাঠ্যক্রমকে একীভূত করে একটি ডিজিটাল উদ্ভাবনীমূলক দক্ষতাভিত্তিক পাঠ্যসূচি তৈরি করা, যাতে সব বাংলাদেশি একইভাবে একসঙ্গে অনাগত ভবিষ্যতের মোকাবিলা করতে পারে।

ডিজিটাল দুনিয়ায় শেষ সীমা বলে কিছু নেই। এখানে সর্বদা নতুন চিন্তা, উদ্ভাবন ও সম্পাদন চক্র চলমান থাকে। প্রয়োজনে যেকোনো সময়ে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়। এডুটেকভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারাই আমাদের মতো চিরাচরিত সমাজকে প্রবুদ্ধ করা সম্ভব। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বর্তমানে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যখন বন্ধ, তখন দেশব্যাপী ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারছি।

তথ্য সূত্রঃ prothomalo.com